উপকূলীয় অঞ্চলে গলদা চিংড়ি ও মনোসেক্স তেলাপিয়ার মিশ্রচাষ কলাকৌশল

বেশকিছু বৎসর যাবৎ বিভিন্ন কারণে বাগদা চিংড়ি চাষের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ায় চাষীরা বিকল্প চাষ হিসাবে গলদা চিংড়ি চাষে মনোযোগ দিচ্ছেন। এর প্রধান কারণগুলো হলো, বাগদার চেয়ে গলদা চিংড়িতে রোগ বালাই কম হয়। ১৪ পিপিটি লবণাক্ত পানিতেও গলদা চিংড়ি চাষ করা যায় এবং বাগদার চেয়ে গলদার চাষ করে অধিক উৎপাদন ও মুনাফা পাওয়া যায় । ফলে, দেশে গলদা চিংড়ির আবাদী জমির পরিমাণ যেমন বাড়ছে তেমনি উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উপকূলীয় ও অ-উপকূলীয় অনেক চাষীই গলদার সাথে অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ করছেন । আমাদের দেশে বেশীরভাগই সনাতন পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে এর উৎপাদন হলো মাত্র ৩০০-৪০০ কেজি/হেক্টর। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশে এর উৎপাদন অনেক বেশী । উন্নত ব্যবস্থাপনা কলাকৌশলের মাধ্যমে এর বর্তমান উৎপাদন হার বহুগুণে বৃদ্ধি করার বিপুল সম্ভবনা রয়েছে।

আধা লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির অনেক রকমের মাছ যেমন-পারশে, খরকুনু, খরশুলা, ভাঙ্গান, চিত্রা, তেলাপিয়া, রুই ইত্যাদির অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রচুর চাহিদা ও মূল্য রয়েছে। এরা রাক্ষুসে মাছের দলভুক্ত নয়। এদের মধ্যে তেলাপিয়া জলবায়ুর পরিবর্তন, পারিপার্শ্বিক উষ্ণায়ন, পানির গভীরতা ও লবণাক্তার ব্যাপক পরিবর্তন সহজেই সহ্য করতে পারে । এসকল মাছ জলাশয়ের উপর ও মধ্য স্তরের খাবার ব্যবহার করে থাকে এবং চিংড়ির সাথে খাবার ও বাসস্থান নিয়ে তেমন প্রতিযোহিতা করে না। তাছাড়া, পানিতে সবসময় এরা ছুটাছুটি করায় পানি অনবরত আন্দোলিত হয়ে থাকে। এতে পানিতে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন দ্রবীভুত হয়, জলাশয়ে উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাস সহজেই বের হয়ে যায়। এদের মল সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় ও প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। ফলে জলাশয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে । উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চিংড়ি ও মাছ একত্রে চাষের মাধ্যমে উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধির জন্য "বাগের হাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রে স্থাপন প্রকল্প" এর অর্থায়নে ইনস্টিটিউটের বাগেরহাটস্থ "চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র" থেকে গলদা চিংড়ির সাথে তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ চাষের কলাকৌশল উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, গলদা চিংড়ি ও তেলাপিয়ার মিশ্রচাষে চাষীরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারেন । পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা ও অনেকটা পূরণ হয়ে থাকে । গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে গলদা চিংড়ি ও তেলাপিয়ার মিশ্রচাষ কলাকৌশল নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১। ঘের নির্বাচন

চিংড়ি/মাছ চাষে মাটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ মাটির গুণাগুণ যদি ঠিক না থাকে তাহলে চিংড়ি/মাছ চাষ করে মুনাফা অর্জন করা যায় না। উর্বর মাটিতে ফসল যেমন ভালো হয় তেমনিই চিংড়ি চাষের জন্য ও উর্বর মাটির ঘের দরকার। এ জন্য দোআঁশ ও এঁটেল মাটির ঘের এদের চাষের জন্য ভালো। মাটির পিএইচ ৬.০-৬.৫ হলে ভাল অবশ্যই প্লাবণ বা দূষণ মুক্ত হতে হবে। এসিড সালফেট মাটির ঘের চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত নয়। ঘেরের সাথে জোয়ার-ভাটার খাল/নদীর সংযোগ থাকলে ভাল হয়। ঘেরের আয়তন ৩০-৫০ শতাংশ হলে ব্যবস্থাপনাকরা সহজ হয়। চিংড়ি/মাছের উৎপাদন ভাল পেতে হলে পানির গভীরতা অবশ্যই ৩-৪ ফুট হওয়া উচিত। গভীরতা ৪ ফুট হলে আরও ভাল হয়। স্বল্প গভীরতা কোনক্রমেই এদের চাষের জন্য ভাল নয়।

২। ঘের প্রস্তুতকরণ

উত্তমরূপে ঘের প্রস্তুত সাফল্যজনক চিংড়ি চাষের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।এর মাধ্যমে ঘেরের অনাকাংখিত প্রাণী অপসারণ করে কাঙ্খিত প্রজাতির জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান বাড়ানো যায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ চিংড়ি চাষীই চিংড়ি লালন-পালনের জন্য প্রাকৃতিক খাবারের উপরই বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল। এ কারণে ঘের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে। ঘের প্রস্তুতের জন্য প্রায় ১-১.৫ মাসের প্রয়োজন হয়। ঘের শুকিয়ে তলদেশের কাদা/পলি অপসারণ করা, তলদেশে সমান করা, পাড় বাঁধা/মেরামত করা, তলদেশে চাষ দেয়া, ছাঁকনী (স্ক্রীন) স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা, অবাঞ্চিত প্রাণী অপসারণ করা, চুন ও সার প্রয়োগ ইত্যাদি কাজ ঘের প্রস্তুতির অন্তর্ভূক্ত। নিম্নে ঘের প্রস্তুতির ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো:

পানি অপসারণ

চিংড়িসহ অন্যান্য সাদা মাছ আহরণের পর পরবর্তী মৌসুমের জন্য ঘের প্রস্তুতিকল্পে ঘের থেকে সমস্ত পানি বের করে দেয়াই উত্তম। এমনভাবে পানি বের করতে হবে যেন ঘেরের কোথাও কোন পানি না থাকে।

ঘের শুকানো

ঘের এমনভাবে শুকাতে হবে যেন তলার মাটি ৩.৩-৬.০ সেমি গভীর পর্যন্ত ফেঁটে যায়। এ অবস্থায় একজন মানুষ ঘেরের তলার উপর দিয়ে সহজে হেঁটে যেতে পারবে এবং তাতে মাটির উপর শুধু পায়ের ছাপ দেখা যাবে কিন্তু পা মাটিতে দেবে যাবে না। শুকানোর ফলে আবর্জনা দূর হয়, তলার মাটি পরিস্কার হয় এবং ক্ষতিকর জীবাণু মারা যায়।

তলার মাটি সরানো

মাটি শুকানোর পর তলদেশের অতিরিক্ত স্তুপীকৃত জৈব পদার্থ, দুগর্ন্ধ যুক্ত কালো মাটি ঘের থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত। এরপর ঘেরের তলা ভালোভাবে সমতল করে নিতে হয় এবং পানি সহজে বের হওয়ার জন্য ঘেরের তলা নিগর্মন পথের দিকে কিছুটা ঢালু হবে।

পাড় বাঁধা/মেরামত

ঘেরের ভিতরের অংশ থেকে মাটি কেটে পুকুরের চারিপার্শ্বে শক্ত, মজবুত, প্রশস্ত ও দৃঢ় পাড় তৈরী করতে হবে। পাড়ে মাটি এমনভাবে বসাতে হবে যেন পাড়ে কোন গর্ত বা ছিদ্র না থাকে। পাড়ের বিভিন্ন ধরণের ছিদ্র বন্ধ করার জন্য পাড়ের মাঝ বরাবর কমপক্ষে ১.০ মি. গভীর পর্যন্ত মোটা পলিথিন সীট স্থাপন করা হয়। চারিপাশ্বের পানির সর্বোচ্চতার মাত্রার চেয়ে প্রধান বাঁধের উচ্চতা কমপক্ষে ১.০মি. বেশি হলে ভাল হয় । প্রধান বাঁধের চেয়ে সহায়ক বাঁধগুলোর উচ্চতা তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে।

চুন ও সার প্রয়োগ

মাটির ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস ও চিংড়ি/মাছের অনুকূল পরিবেশ তৈরীর জন্য পাড় বাঁধা/মেরামত করার পর হেক্টর প্রতি ২৫০ কেজি চুন {CaO এবং $CaMg(CO_3)_2$=৩:১} ঘেরের পাড়সহ তলায় ভালভাবে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। পোড়া চুনের সাথে ডলোচুন ব্যবহারের ফলে মাটির বাফার ক্ষমতা (অম্লত্ব-ক্ষারত্বের মাত্রার মধ্যবর্তী স্থিতাবস্থা) বৃদ্ধি পায়। মাটির জৈব পাদার্থের পরিমাণ ৩% এর কম হলে নাইট্রোজেন জাতীয় সার (১০০-১২৫ কেজি/হে) এবং প্রোবায়োটিক্স (সুপার বাইওটিক, অ্যাকুয়া মেজিক) (১০-১৫ কেজি/হে) ব্যবহার করলে মাটির গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

চাষকরণ

চুন প্রয়োগের পর ঘেরের তলার মাটি পাওয়ার টিলার দিয়ে ৬-৮ সে.মি. গভীর পর্যন্ত চাষ করার ফলে চুন ভালভাবে মাটির সাথে মিশে যায় এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। চাষ দেয়ার ফলে মাটি ভালভাবে উলট-পালট হয়, নিচের মাটি বায়ুর সংস্পর্শে আসে, জারণ-ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং পুষ্টি উপাদান অবমুক্ত হয়। ফলে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়।

বেড়া দেয়া

ছোট মেস সাইজের নাইলন জাল দিয়ে ঘেরের চারিপার্শ্বে বেড়া দেয়া হয়। বেড়া দেয়ায় কাঁকড়া, ব্যাঙ,কুঁচে, শামুক এবং জীবাণুবাহক অন্যান্য ক্ষতিকর প্রানী ঘেরে প্রবেশ করতে পারে না। বেড়ার উচ্চতা প্রায় ১.০ মি. হলে ভাল হয়।

নার্সারী পদ্ধতি

মূল ঘেরে ছাড়ার আগে মূল ঘেরের একটি অংশে অধিক ঘনত্বে পোনা ছেড়ে ৪-৬ সপ্তাহ লালন পালন করাই হল নার্সারী ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে চাষকালীন সময়ে চিংড়ি/মাছের মৃত্যু হার বহুলাংশে হ্রাস করা যায়। বিভিন্ন ধরণের নার্সারী পদ্ধতি রয়েছে। সাধারণত মূল ঘেরের একটি কোণায় নার্সারী পুকুর তৈরী করা ভাল । অনেক ক্ষেত্রে নার্সারী পুকুরের পাড় মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়। এক্ষেত্রে, মূল ঘেরে জোয়ারের পানি ঢোকানো হলে নার্সারী পুকুর/টপে পানি প্রবেশ করে। ভাটায় ঘের থেকে পানি বের করলে টপের পানিও কমে যায়। অনেক সময়, পুকুরের এক কোণায় বাশেঁর ফ্রেমের সাথে ক্ষুদ্র ফাঁসের নাইলন নেট ভালভাবে বেঁধে প্রায় ১.০-১.৫ মি. উচু ঘেরা ও করে নার্সারী পুকুর তৈরী করা যায় । নার্সারী পুকুরের আয়তন হবে মূল ঘেরের আয়তনের ৫-৭ ভাগ । নার্সারী পুকুরে নাইলন নেট এবং বাঁশের কঞ্চি/শুকনো নারকেল পাতা পুঁতে দিলে এগুলো চিংড়ি পোনার আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এগুলোর উপর জন্মানো পেরিফাইটন পোনার পছন্দনীয় প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, এগুলো বিভিন্ন ধরণের শত্রুর আক্রমণ থেকেও ছোট ছোট পোনাকে রক্ষা করে থাকে।

জরুরী নির্গমন পথ

বর্ষা মৌসুমে কখনো কখনো অতি বর্ষণে পানির উচ্চতা বেড়ে যায়। ঘেরের পানির সর্বাধিক উচ্চতায় পাড়ের ভিতর কয়েকটি পিভিসি পাইপ বসিয়ে দিলে এই পথ দিয়ে অতিরিক্ত পানি সহজেই বের করে দেয়া যায়।

স্ক্রীন/বানা স্থাপন

রাক্ষুসে মাছ বা প্রাণি যেমন- ভেটকি, টেংরা, বেলে, কাঁকড়া ইত্যাদি কারণে পোনার মৃত্যু ও হার বহুগুণে বেড়ে যায়। জোয়ারের পানির সাথে এসব প্রাণি সহজেই ঘেরে ঢুকে পড়ে। পানির প্রবেশ/নির্গমন পথে স্ক্রীন (বাঁশের পাটা ও নাইলনের জাল দিয়ে তৈরী) স্থাপন করে রাক্ষুসে প্রাণি প্রতিরোধ করা যায়।

পানির উৎস

নিকটবর্তী নদী/খাল থেকে ধাপে ধাপে স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে ছেঁকে পরিমাণ মত পানি ঘেরে ঢুকানো ভাল। পানির গভীরতা কমপক্ষে ১.০ মি. থাকা উচিত। চিংড়ির মড়ক ও কম উৎপাদনের প্রধান কারণই হল পানির অপর্যাপ্ত গভীরতা।

অনাকাংখিত প্রাণি অপসারণ

জোয়ারের পানির সাথে বিভিন্ন প্রাণির ডিম, লার্ভি ও পোনা নানাভাবে ঘেরে চলে আসে। এসব প্রাণি খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে কাঙ্খিত প্রাণির সাথে প্রতিযোগিতা করে থাকে। সুযোগ পেলেই রাক্ষুসে প্রাণি কাঙ্খিত প্রাণিকে খেয়ে ফেলে। একাধিকবার জাল টেনে এসব প্রাণি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা ভাল ফল বয়ে আনে না। বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে এসব প্রাণি দূর করা যায়, যা খুবই কার্যকর, দ্রুত এবং কম ঝামেলা পূর্ণ। এক্ষেত্রে কার্যকর রাসায়নিক পদার্থ গুলো হলো- রোটেনন, মহুয়া ওয়েল কেক, টি সীড কেক, ফসটোক্সিন টেবলেট ইত্যাদি। রোটেনন, মহুয়া ওয়েল কেক, টি সীড কেক বাজারে সবসময় পাওয়া যায় এবং এদের প্রয়োগ মাত্রা হলো যথাক্রমে ৩.০ পিপিএম, ২০০.০-২৫০.০পিপিএম এবং ৭৫-১০০.০পিপিএম। ফসটোক্সিন/কুইক এবং টেবলেট সবসময় বাজারে পাওয়া যায় না। শতাংশ প্রতি এই টেবলেট ২-৩ টি ব্যবহার করার পর এসব পদার্থের বিষক্রিয়া প্রায় ৭-১০ দিন পর্যন্ত থাকে।

চুন ও সার প্রয়োগ

ঘেরে প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন ব্যবহার করা ঘের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চুনের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে । বিভিন্ন ধরণের চুন যেমন- পোড়/পাথর/কুইক চুন (CaO),কলি/হাইড্রেড/স্লেক চুন {$Ca(OH)_2$}, কৃষিজ ($CaCO_3$) এবং ডলোচুন { $CaMg(CO_3)_2$} ইত্যাদি বাজারে পাওয়া যায় এগুলোর ভিতর ডলোচুন সবচেয়ে বেশী কার্যকর। কিন্তু এটি সবসময়ে বাজারে পাওয়া যায় না । পোড়া/কৃষিজ চুন সাধারণত ঘেরে ব্যবহার করা হয়। হেক্টর প্রতি ২৫০ কেজি চুন ঘেরের তলায় এবং পাড়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। মাটির পিএইচ এর ওপর ভিত্তি করে ঘেরে চুন প্রয়োগের মাত্রা সারণি-১ এ প্রদান করা হলো। কলি চুন এবং পোড়া চুনের পরিমাণ কৃষিজ চুনের সমান যা বর্ণিত সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়:

$CaCO_3$ =০.৭৫ $Ca(OH)_2$= ০.৫ CaO।

চুন প্রয়োগের পর পরবর্তী কাজ হলো ঘেরে অজৈব সার যেমন- ইউরিয়া, টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট), ডেএপি (ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট) এবং এমপি (মিউরেট অব পটাস) ইত্যাদি ব্যবহার করা। চুন প্রয়োগের ৩-৫ দিন পর ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমপি ইত্যাদি সার একত্রে হেক্টর প্রতি ব্যবহার মাত্রা হলো যথাক্রমে ২০-২৫ কেজি, ৩০-৩৫ কেজি এবং ৬-৮ কেজি। এসকল সার পানিতে প্লাংকটন উৎপাদন নিশ্চিত করে। বালতি বা গামলায় পরিমাণমত সার নিয়ে ধীরে ধীরে বালতিতে পানি যোগ করে সমস্ত সার পানির সাথে মিশে সমস্ত ঘেরে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের ৫-৭ দিনের মধ্যে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মানোর ফলে পানির রং যখন সবুজ হয়ে যায় তখনই ঘেরে চিংড়ি/সাদা মাছের পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়। পোনা মজুদের পরবর্তী পর্যায়ে ইউরিয়া ও টিএসপি পানির রং এর ওপর ভিত্তি করে একই হারে বা

অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ হারে প্রয়োজনে ৭-১০ দিন পর পর প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া/টিএসপি এর পরিবর্তে জৈব সার হিসেবে প্রয়োগের জন্য প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম চাউলের কুড়া, ১০০/২০০ গ্রাম চিটা গুড় ও ১-১.৫ চা চামচ পরিমাণ ইস্ট ব্যবহার করা যায়। উপাদানগুলো প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানিতে ২৪ ঘন্ট ভিজিয়ে রাখার পর ছেঁকে শুধু পানি ঘেরে সমানভাবে প্রয়োগ করতে হয় এবং অবশিষ্টাংশ পুনরায় ভিজিয়ে রাখতে হয় । এভাবে পর পর ৩ দিন উক্ত সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারণি ১. ঘেরের তলার মাটির পিএইচ এর ওপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাত্রা।

মাটির পিএইচ	ক্যালসিয়াম কার্বনেট এর মাত্রা কেজি/শতাংশ)
প্রায় ৭.০	০.৮~১.০
৫.০~৬.৫	৪.০~৮.০
৪.০~৫.০	১২.০~১৬.০

৩. পোনা মজুদ

সার ব্যবহারের ৫-৭ দিন পর ঘেরে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন হলে পানির রং সবুজ বা হালকা বাদামি রং ধারণ করে। সেক্কি ডিস্ক বা হাত কনুই পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা পরীক্ষা করা যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মানোর পরই চিংড়ি/মাছের জুভেনাইল/আঙ্গুলে পোনা/পোনা মজুদ করতে হয়। স্ত্রী/মায়া চিংড়ি পোনার চেয়ে পুরুষ চিংড়ি পোনা মজুদ করাই উত্তম। পুরুষ চিংড়ি দ্রুত বড় হয়। এদের বাজারে চাহিদা বেশি এবং দামও বেশি। পক্ষান্তরে স্ত্রী চিংড়ি বড় হতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়, বাজারে এদের চাহিদা এবং মূল্যও কম। চিংড়ি পিল এর চেয়ে জুভেনাইল মজুদ করলে ভাল হয়। কারণ জুভেনাইল মজুদ করার পর ৫-৬ মাসের মধ্যেই বাজারজাত করা যায়। কিন্তু, পিএল লালন-পালন করে বাজারজাত করতে সময় লাগে প্রায় ১২-১৪ মাস । মার্চ/এপ্রিল মাসে চিংড়ি ও মাছের পোনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট হারে ঘেরে মজুদ করতে হয় (সারণি-২)। ২টি উৎস থেকে চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করা যায়, যথা-প্রাকৃতিক ও হ্যাচারী। হ্যাচারীর পোনার চেয়ে প্রাকৃতিক/নদীর পোনার দাম বেশি এবং এরা তাড়াতাড়ি বড় হয়। ঘেরে মনোসেক্স তেলাপিয়া ব্যতিত অন্য জাতের তেলাপিয়া ছাড়া উচিত নয়। কারণ অন্য জাতের তেলাপিয়া ছাড়ার পর ২-৩ মাসের মধ্যেই বাচ্চা দিতে শুরু করে এবং খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় চিংড়ি ও কাঙ্খিত মাছের ভাল উৎপাদন পাওয়া যায় না।

সারণি ২. প্রতি শতাংশে পোনা ছাড়ার পরিমাণ।

চিংড়ি/মাছের নাম	পোনার সংখ্যা			পোনার আকার (ইঞ্চি)
	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩	
গলদা চিংড়ি	১০০ টি	৮০ টি	৮০ টি	৪-৫
মনোসেক্স তেলাপিয়া	৪০ টি	৪০ টি	২৮ টি	১-২
রুই	-	-	১২ টি	১০-১২

ভাল উৎপাদনের জন্য চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের সুস্থ ও সবল বড় সাইজের পোনা নির্বাচন করা আবশ্যক। নতুবা আশানুরুপ উৎপাদন পাওয়া যায় না। চিংড়ি অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রাণী। তাই সকালে কিংবা বিকালে ঠান্ডা পরিবেশে এদের পোনা পরিবহন করতে হয়। পোনা সরাসরি ঘেরে ছাড়া উচিত নয়। ঘেরে ছেড়ার পূর্বে ভালভাবে নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্থ করে পোনা মজুদ করা উচিত। চিংড়ি ও মাছের পোনা এক সাথে না ছেড়ে চিংড়ি ছাড়ার ২৫-৩০ দিন পর মাছের পোনা ছাড়াই উত্তম। ভাল উৎপাদন ও অধিক মুনাফা পেতে হলে সারণি-২ এ প্রদত্ত নমুনা-৩ অপেক্ষা নমুনা-১ নতুবা নমুনা-২ অনুযায়ী পোনা ছাড়াই উত্তম। কারিগরি জ্ঞান, আর্থিক সামর্থ, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে মজুদ ঘনত্ব কমবেশি হতে পারে। তবে ভাল উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে সঠিক মাত্রায় পোনা মজুদের কোন বিকল্প নাই।

সুস্থ পোনা চেনার উপায়

- সুস্থ,সবল ও নিরোগ পোনার রং উজ্জ্বল ও চকচকে হয় এবং গায়ে কোনরূপ দাগ থাকে না। পরজীবি কিংবা ফাংগাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কোন লক্ষণ দেহে দেখা যায় না
- পাত্র বা পলিথিন ব্যাগের তলদেশে পোনা জড়ো হয়ে থাকে না । সামান্য শব্দ বা কোন কিছুর উপস্থিতিতে পোনা চতুর্দিকে ছুটাছুটি করতে থাকে
- গামলায় পানিসহ কিছু পোনা নিয়ে মৃদু স্রোতের সৃষ্টি করলে কিছুক্ষণ পরই পোনা বিপরীতে চলাচল করতে থাকে
- পুচ্ছ পাখনা (ইউরোপড) বৈদ্যুতিক পাখার মত ছড়ানো থাকে এবং করাত (রোস্ট্রাম) থাকে সোজা।

ভাল উৎপাদন পেতে হলে অবশ্যই উপরে বর্ণিত পোনার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় রেখে পোনা নির্বাচন ও ক্রয় করা অতীব জরুরী। বাজার/আড়ৎ থেকে ছোট-বড় আকারের পোনা ক্রয় না করে একই আকারের পোনা ক্রয় করাই উত্তম।

৪. খাদ্য প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি ও মাছ চাষের জন্য খাদ্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি প্রতিদিন এদেরকে সম্পূরক খাদ্য দেয়া প্রয়োজন এবং খাদ্য অবশ্যই পুষ্টিসমৃদ্ধ হতে হবে। খাদ্যের গুণগতমানের ওপর উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল। ঘেরে ব্যবহৃত খাদ্যের মান ও খাদ্যের পরিমাণ চিংড়ি/মাছের স্বাস্থ্য ও পানির গুণগত মানকে সরাসরি প্রভাবিত করে। চাষ ব্যবস্থাপনায় শুধু খাদ্যের জন্যই মোট পরিচালনা ব্যয়ের প্রায় ৪০-৫০ ভাগ অর্থ ব্যয় হয়। সরবরাহকৃত খাদ্য অব্যবহৃত থাকলে যেমন আর্থিক অপচয় হয় তেমনি অতিরিক্ত খাদ্য পচে ঘেরের পরিশে নষ্ট হয়। এছাড়া খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত্য না হলে চিংড়ি এবং ভোক্তা উভয়েরই ক্ষতি হতে পারে।

চালের কুড়া, আটা, শুকনো মাছের গুড়ো/মিট এন্ড বোন, সরিষার খৈল, ঝিনুক চূর্ণ, ভিটামিন ইত্যাদি উপাদান মাছের জন্য খাবার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পোনা ছাড়ার দিন হতেই ঘেরে খাবার প্রয়োগ করতে হবে। কুড়া ৪৫ ভাগ, আটা ২৩ ভাগ, শুটকি গুড়া ২০ ভাগ, খৈল ১০ ভাগ, ঝিনুকের গুড়া ১ ভাগ ও ভিটামিন ১ ভাগ একত্রে মিশিয়ে প্রস্তুতকৃত খাবার মাছের পোনার দৈহিক ওজনের ৫-৩ ভাগ হারে প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে প্রয়োগ করা যায়। খৈল পানির মধ্যে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে খাবার তৈরী করতে হয় । বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের সমন্বয়ে খামারে প্রস্তুতকৃত চাহিদা পরিমাণ প্রতিদিনকার খাবার ঐ দিনই ঘেরে প্রয়োগ করাই উত্তম। চিংড়ি খাবার দেয়ার অন্তত: ২৫-৩০ মিনিট আগে মাছের খাবার প্রয়োগ করতে হয়। এতে মাছের ক্ষুধা মিটে যাওয়ায় চিংড়ির খাবার নিয়ে মাছ প্রতিযোগিতা করে না। পিলেটেড খাবার (সৌদি বাংলা স্পেশাল ফিড বা কোয়ালিটি ফিড) কিংবা বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান একত্রে মিশিয়ে মন্ড বা গোল্লা তৈরী করে চিংড়ির খাবার হিসাবে প্রয়োগ করা যায়। নিম্নে সারণি-৩ এ উল্লেখিত ছক অনুযায়ী চিংড়ির খাবার প্রস্তুত করে প্রতিদিন ব্যবহার করা যায় কিংবা ভালোভাবে শুকিয়ে পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করেও রাখা যায়।

সারণি-৩.গলদা চিংড়ির মানসম্মত খাদ্য তৈরীর বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ।

খাদ্য উপাদান	পিএল খাদ্য(%)			মজুদ ঘেরে চিংড়ির খাদ্য(%)		
	নমুনা- ১	নমুনা-২	নমুনা-৩	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩
চাউলের কুড়া	৪৩	৪৫	১৬	৩৮	২৪	২৮
চাউলের ক্ষুদ	১০	-	-	-	-	-
মিট ও বোন চূর্ণ	-	-	২২	১০	২০	-
মাছের গুড়া(ফিশ	২০	৮	২৫	২০	১৫	৩০

মিল)						
সরিষার/তিলের খৈল	৫	৩০	১৫	১০	১৫	৩০
ভূট্রা গুড়া	-	-	১৬	-	২০	-
চিটাগুড়/আটা/ময়দা	২০	১৫	৫	২০	৫	১০
ঝিনুক চূর্ণ	১	১	-	১	-	১
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	১	১	১	১	১	১

খাদ্য খরচ ও অপচয় কমানোর জন্য চিংড়িকে পিলেট খাবার দেয়াই ভাল। ঘেরে চিংড়ির মোট দেহ ওজনের অনুপাতে নির্দিষ্ট সময় পর পর খাবার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিদিন খাদ্য দানিতে (ফিডিং ট্রে) খাবার প্রয়োগ করলে ভাল হয়। এক বিঘা আয়তনের একটি ঘেরে সাধারণত ২-৩ টি খাদ্যদানি ব্যবহার করা যায়। খাদ্যদানি ব্যবহারের মাদ্যমে প্রয়োগকৃত খাবার অবশিষ্ট থেকে যায় কি-না তা থেকে খাবার গ্রহনের পরিমাণ নির্ণয় করে তদনুযায়ী চিংড়ির খাবার চাহিদা সহজেই নিরূপণ করা যায়। চিংড়ির মোট দেহ ওজনের ৫-৩ ভাগ হারে দৈনিক ২-৩ বা ৩-৪ বার নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করতে হয়। প্রত্যেকবার খাবার প্রয়োগের আগে প্রয়েঅজনীয় খাবার দু' ভাগ করে অর্ধেক খাদ্যদানিতে এবং বাকী অর্ধেক ঘেরের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে প্রয়োগ করলে ভাল হয়। তবে কিছু দিন পর পর (১০-১২দিন) খাবার প্রয়োগের স্থান পরিবর্তন করে নিলে পানির গুণাগুণ ভাল থাকে এবং দূষিত গ্যাস সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ কমে যায়। চিংড়ির খাবার সবসময় মাছের খাবারের পর সরবরাহ করতে হয়।

৫. পানি ব্যবস্থাপনা

পানির গুণাগুণ নিয়ামকসমূহ একটি অন্যটির সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাঙ্খিত উৎপাদনের জন্য অবশ্যই পানির বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং ভালভাবে পানির ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নিম্নে পানির কতিপয় গুণাগুনের উপর আলোকপাত করা হলোঃ

গভীরতাঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ চিংড়ি চাষের ঘেরে পানির গভীরতা খুবই কম। অধিক গরমের সময়ে পুকুরের তলার ছোট-বড় বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ মারা যায় এবং পঁচতে থাকে। এসব উদ্ভিদের পঁচনের ফলে পানিতে অম্লত্বের সৃষ্টি হয়, যাহা চিংড়ি ও মাছের জন্য ক্ষতিকর । পানির গভীরতা অবশ্যই ৪ ফুট হলে সবচেয়ে ভাল হয়। গভীরতা কম হলে পানির তাপমাত্রা বেড়ে যায়। চিংড়ি বিভিন্নভাবে পীড়িত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে মারা

যায়। কাঙ্খিত মাত্রার গভীরতা থাকলে হঠাৎ করে তাপমাত্রা, পিএইচ ও লবণাক্ততা একসাথে উঠা-নামা করে না। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টিপাতের ফলে কম গভীরতার ঘেরে উপরোক্ত গুণাগুণগুলো দ্রুত উঠা-নামা করতে থাকে। চিংড়ি এ ধরণের দ্রুত পীড়িত হয়ে মারা যায়। এভাবে কমে যাওয়া চিংড়ি অনেকটা লালচে রঙের হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে পচতে থাকে ও ঘেরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়।

তাপমাত্রাঃ জলজ প্রাণিকুলের জন্য তাপমাত্রা একটি অত্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক। চিংড়ির বর্ধন, প্রজনন, খাবার গ্রহণ, উৎপাদন এবং অন্যান্য জৈবিক কার্যাবলী পানির তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। চিংড়ি চাষের উত্তম তাপমাত্রা হলো ২৫-৩১° সে.। অনুকূল মাত্রায় তাপমাত্রা রাখার জন্য পানির গভীরতা অবশ্যই সঠিক মাত্রায় রাখতে হবে। নচেৎ তাপমাত্রা সহনশীল মাত্রার বেশি হয়ে যায়, যা চিংড়ির জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাহির থেকে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আদর্শ গভীরতায় তাপমাত্রা খুব বেশি উঠা-নামা করে না। বাদলা/বর্ষা দিনে পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ কমে যাওয়ায় চিংড়ি অসুস্থ ও দর্বল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে মারা যায়। এ অবস্থায় ১/২ দিন পর পর পানির গভীরতার ওপর ভিত্তি করে শতাংশ প্রতি ১০০-২৫০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগে অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়।

লবণাক্ততাঃ চিংড়ি বেচেঁ থাকার ওপর লবণাক্ততার প্রভাব তাপমাত্রার মত এতটা প্রকট নয়। ঘেরের লবণক্ততা বৃষ্টিপাত ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। কিন্তু হঠাৎ এর পরিবর্তন চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর বিধায় পানির অনুকূল গভীরতা বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। গলদা চিংড়ি ১৪ পিপিটি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। অপরদিকে, তেলাপিয়া ১৮-২০ পিপিটি এবং রুই মাছ ১২-১৩ পিপিটি পর্যন্ত সহ্য করতে পারে।

ক্ষারত্বঃ জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা নিয়ন্ত্রণে ক্ষারত্বের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খুব কম বা খুবই বেশি ক্ষারত্ব প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার জন্য অনুকূল নয়। ক্ষারত্ব বৃদ্ধির সাথে পানির প্রাকৃতিক উর্বরতা ও বৃদ্ধি পায়। চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত ক্ষারত্বের মাত্রা হলো ৬০-১৮০ মিগ্রা/লি। নিয়মিত মানসম্পন্ন চুন ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

পিএইচঃ চিংড়ি/মাছ চাষের জন্য পিএইচ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এটি পানির অম্লত ও ক্ষারত্ব নির্দেশ করে। অধিকাংশ জলাশয়ের পানির পিএইচ হলো ৬.৫-৮.৫। চিংড়ি চাষের জন্য নিরপেক্ষ পিএইচ (৭.০) বা হালকা ক্ষারত্বই ভাল, অর্থাৎ চাষের জন্য উত্তম পিএইচ হলো ৭.০-৮.৫। একে পানির পাল্স বলা হয়। বৈশাখ/জ্যৈষ্ঠ/আষাঢ় মাসে ঘেরে পানি কম থাকে এবং হঠাৎ বৃষ্টিপাত হলে পানির পিএইচ হঠাৎ খুব বেশি উঠা-নামা করতে থাকে। পিএইচ এর এরুপ পরিবর্তন চিংড়ি সহ্য করতে না পেরে পীড়িত হয়ে মারা যায়। পানি পরিবর্তন ও চুন প্রয়োগে এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

দ্রবীভূত অক্সিজেনঃ প্রতিটি জলজ প্রাণির জন্যই অক্সিজেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিংড়ি ও মাছের বর্ধন,খাদ্য গ্রহণ ও ভাল উৎপাদনের জন্য এটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। পানির তাপমাত্রা,

শাররীক অবস্থা, বয়স, দিনের সময়, প্রজাতি, ঋতু, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদির ওপর অক্সিজেনের অনুকূল মাত্রা হলো ৪.০ মিগ্রা/লি চেয়ে বেশি । গভীরতা কম হলে গরম মৌসুমে দিনের বেলায় পানির তাপমাত্রা বাড়তে থাকে । এতে চিংড়িসহ অন্যান্য মাছ

চতুর্দিকে ছুটাছুটি করতে থাকে এবং অক্সিজেনের অভাবে এরা ধীরে ধীরে মারা যায়। পচনশীল পদার্থের অক্সিজেন গ্রহণের কারণে অনেক সময় শেষ রাত্রে এর ঘাটতি মারাত্বক পর্যায় পৌঁছায়। তাই জলজ উদ্ভিদ ও তলার কাদা নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। পানি পরিবর্তন/বৃদ্ধি ও অ্যারেশনের মাধ্যমে ঘেরের অক্সিজেনের স্বল্পতা দূর করা যায়।

অ্যামোনিয়াঃ চিংড়ি ও মাছের মলমূত্র এবং বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদর পচনের ফলে পানিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়ে থাকে। আন-আয়োনাইজড অ্যামোনিয়া জলজ প্রাণি বিশেষ করে চিংড়ি ও মাছ এর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আন-আয়োনাইজড অ্যামেনিয়ার মাত্রা ১ মিগ্রা/লি এর চেয়ে বেশি হলে তা চিংড়ির জন্য বিপদজনক। চিংড়ির বর্ধনের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে থাকে। চিংড়ি চাষের জন্য উত্তম মাত্রা হলো ০.১ মিগ্রা/লি এর চেয়ে কম। কম গভীরতায় উচ্চ তাপমাত্যায় পানির অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি অনুকূল মাত্রায় না থাকার কারণে এর তীব্রতা বাড়তে থাকে। ফলে পানি দূষিত হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে চিংড়ি/মাছ অজ্ঞান হয়ে মারা যায়। বিশেষ করে গরমকালে অধিকাংশ ঘেরের চিংড়ি এ অবস্থার শিকার হয়ে থাকে। সঠিক গভীরতার ঘেরের তলদেশ আগাছামুক্ত রাখলে এ ধরণের অসুবিধা হয় না। পানি পরিবর্তন ও মানসম্মত চুন প্রয়োগ করে এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

হাইড্রোজেন সালফাইডঃ সকল জলজ জীবের জন্য এটি একটি বিষাক্ত গ্যাস ।এর গন্ধ অনেকটা পচা ডিমের মত। অত্যাধিক জৈব পদার্থ পচনের ফলে ঘেরের তলদেশে এটি উৎপন্ন হয়ে থাকে। পানিতে এর মাত্রা ০.০৩ মিগ্রা/লি এর চেয়ে কম হলে জলজ পরিবেশ ভাল থাকে । জৈব পদার্থ পচন ক্রিয়ায় অক্সিজেনের ঘাটতি হতে থাকে এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামকগুলোর মাত্রা এ অবস্থায় অনুকূলে না থাকায় এই গ্যাসের বিষাক্ততার মাত্রা বেড়ে যায়। এর উগ্র ও ঝাঁঝালো গন্ধে চিংড়ি/মাছ ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। চুন প্রয়োগ, পানি পরিবর্তন নতুবা পানির আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৬. সার প্রয়োগ

চাষকালে ঘেরের পানির কাঙিক্ষত রং হচ্ছে বাদামি সবুজ বা হলুদাভ সবুজ। পানিতে প্লাংকটনের (উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা) উপস্থিতির কারণে এসব রং হয়ে থাকে। প্লাংকটনের আধিক্য বা স্বল্পতার

কারণে পানির রং পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং একই ঘেরে বছরের বিভিন্ন সময়ে পানির রঙে পার্থক্য দেখা যায়। তাই নিয়মিত ভাবে প্লাংকটনের প্রাচুর্যতা পরীক্ষা করে ঘেরে সার প্রয়োগ করতে হয় । চিংড়ি/মাছ ছাড়ার পর থেকে এদের প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চয়তার জন্যে পানির রং পর্যবেক্ষণ করে ৭-১০ দিন পর পর প্রতি শতাংশে ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসপি নতুবা ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসপি পানিতে ভালভাবে গুলে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। অজৈব সারের পরিবর্তে জৈব সার হিসাবে শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম চাউলের কুড়া, ৫০ গ্রাম চিটা গুড় ও আধা চা চামচ ইস্ট একত্রে একটি পাত্রে পর্যপ্ত পরিমাণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে ২৪ ঘন্টা পর নাইলন নেট দিয়ে ছেঁকে শুধু পানিটুকু সমস্ত ঘেরে ভালভাবে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যায়। অবশিষ্টাংশ আবার পানিতে ভিজিয়ে রেখে ২৪ ঘন্টা পর ছেঁকে পানিটুকু ঘেরে ব্যবহার করতে হয়। এভাবে পর পর ৩ দিন এ কাজটি করতে হয়। নেটের মাধ্যমে নিঃসৃত পানি ঘেরে প্রয়োগ করলে পানিতে প্রচুর প্রাণিকণা জন্মে যা চিংড়ি/মাছের উত্তম খাবার। কোন অবস্থাতেই সার হিসাবে প্রাণির বিষ্টা ব্যবহার করা যাবে না কারণ এতে ক্ষতিকর বিভিন্ন রকমের জীবাণু থাকে, যা মানবদেহে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। পানির গভীরতার উপর নির্ভর করে সারের মাত্রা কমবেশি করে নিতে হয়। বৃষ্টি বাদলের দিনে সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। রৌদ্র উজ্জ্বল দিনে সকাল ৯-১০ টায় সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রাকৃতিক খাদ্য ও উপস্থিতি বিবেচনায় রেখে সারের মাত্রা কমবেশি করতে হয়। পরিস্কার আলোকিত দিনে সকাল ১০-১১ টায় পানিতে হাত কুনুই পর্যন্ত ডুবালে তালু দেখা গেলে কিংবা সেক্কি ডিস্ক ডুবানোর পর ডিস্কের সাদা অংশ যদি দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে পানিতে খাদ্যের পরিমাণ কম আছে এবং ঘেরে সার প্রয়োগ করা উচিত।

৭. স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি/মাছ ঘেরে ছাড়ার পরবর্তী মাস থেকে নিয়মিত (১০-১৫ দিন অন্তর) জাল দিয়ে এদের ধরে ওজন বৃদ্ধি, দেহের বাহ্যিক অবস্থা ও রোগ-বালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হয়। রোগের লক্ষণ হিসেবে চিংড়ির ক্ষেত্রে খোলস নরম ও পাতলা গায়ে কালো কালো দাগ, লেজ ভাঙ্গা ও পচন ধরা, ফুলকাতে কালো কালো দাগ পড়া ও পচন ধরা, গায়ে শ্যাওলার আবরণ পড়া, খোলসে পরজীবি লেগে থাকা, এন্টেনা, পা ও লেজ খসে পড়া, খোলস শক্ত হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি এবং সাদা মাছের ক্ষেত্রে লেজ ও পাখনা ভাঙ্গা ও পঁচা, পেটফুলে যাওয়া, মাথা বড় শরীর চিকন ইত্যাদি দেখা যায়। দূষিত পানি, ভেজাল খাদ্য ও সার এবং গভীরতা চিংড়ি/মাছের রোগে আক্রান্ত হলে খামার থেকে এদের সংখ্যা কমিয়ে দ্রুত পানি পরিবর্তন ও পানির পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুবা নিকটস্থ মৎস্য অফিসারের পরামর্শ নিতে হবে। চিংড়ি অত্যন্ত সংবেদনশীল, নরম ও দুর্বল প্রাণি তাই খুব দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে রোগের প্রতিরোধই প্রতিকারের চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। কিছুদিন পর পর জাল টেনে

চিংড়ি/মাছের বৃদ্ধির হিসেবে রাখতে হয় ও ওজন বৃদ্ধির অনুপাতে প্রতিদিনের খাবারর পরিমাণ নির্ণয় করে প্রয়োগ করতে হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওজন নেয়ার কাজ সকালের ঠান্ডা পরিবেশে সম্পন্ন করাই ভাল। খামার সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। এতে তলায় কোন ধরেণের বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হতে পারে না এবং পচনশীল পদার্থ না থাকায় অক্সিজেন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা ও থাকে না। মাঝে মাঝে খামারে এলোমেলোভাবে জাল টানলে অতিরিক্ত খাদ্য পচনে সৃষ্ট গ্যাস বেরিয়ে যায় ও জমে থাকা খাদ্য পুনুরায় ব্যবহৃত হয় এবং চিংড়ি/মাছের অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকে।

৮. চিংড়ি/মাছ আহরণ ও উৎপাদন

চিংড়ির জুভেনাইল ৪-৫ গ্রাম, তেলাপিয়া ১.৫-২.০ গ্রাম এবং রুই ২০০-২৫০ গ্রাম ওজনের মজুদ করলে ৫-৬ মাসের মধ্যে বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়। তবে তেলাপিয়া ৪-৪.৫ মাসেই ধরে ফেলা যায়। কিছু কিছু চিড়ি/মাছ খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে থাকে। আংশিক ও সম্পূর্ণ এ দু'ভাবে খামার থেকে এদের আহরণ করা যায়। বড় চিংড়ি/মাছগুলো যদি চারু (ট্রেপ)/ঝাকি জাল দিয়ে ধরে ফেলা হয় তাহলে বাকিগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পায় এবং এতে সার্বিক উৎপাদন বেড়ে যায়। সে কারণে অনেক সময় আংশিক আহরণে অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভবান হওয়া যায়। তাছাড়া আংশিক আহরণে চুরি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিও অনেক কমে যায়। চিংড়ি/মাছের আকার, বাজার চাহিদা, মূল্য, ঝুঁকি এবং খামারের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে চিংড়ি/মাছন ধরতে হয়। ঠান্ডা ও ভালো আবহাওয়া বিশেষ করে ভোর বেলা চিংড়ি/মাছ ধরার উত্তম সময় । এ ছাড়া স্থানীয় বাজার সময় ও বিবেচনায় রাখা উচিত। চিংড়ি/মাছ ধরার পর মহুর্তেই ভাল পরিষ্কার পানি দিয়ে এগুলো ভালভাবে ধুইয়ে বরফ দিয়ে স্বাস্থ্যকর পাত্রে সংরক্ষণ করে বাজারজাতকরণের জন্য দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হয়। চিংড়ি ধরে ফেলে রাখলে এতে তাড়াতাড়ি পচন ধরে এবং নরম হয়ে যায়। নরম ও পচা চিংড়ির বাজার মূল্য খুবই কম অনেক সময় বিক্রির অযোগ্য হয়ে পড়ে। ভাল দাম পেতে হলে চিংড়ি/মাছের গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার প্রতি অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে।

চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র থেকে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় ১৮০ দিন (৬ মাস) চাষ মেয়াদে গলদা চিংড়ি গড় ওজন ৮৪ গ্রাম ও বাঁচার হার ৬৩% এবং ১৫০ দিনে তেলাপিয়ার গড় ওজন ১৪৯ গ্রাম ও বাঁচার হার ৭৩% হিসেবে হেক্টর প্রতি মোট ২,১৩৩ কেজি (১,০৪৬ কেজি চিংড়ি+১,০৮৭ কেজি তেলাপিয়া) চিংড়ি ও তেলাপিয়া পাওয়া যায়। একই মেয়াদে গলদা-তেলাপিয়ার সাথে রুই মাছ চাষ করে হেক্টর প্রতি এদের মোট উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১,৬৫৬ কেজি এবং একক গলদা চাষে হেক্টরে গলদার উৎপাদিত পরিমাণ হলো মাত্র ১,১০৫ কেজি যা মিশ্রচাষের চেয়ে অনেক কম।

৯. আয় ও ব্যয়

এক হেক্টর একটি খামারে গলদা চিংড়ি ও তেলাপিয়া চাষ করে হেক্টর প্রতি ৪.২ লক্ষ টাকা খরচ করে ৬.৬ লক্ষ টাকার চিংড়ি ও মাছ বিক্রি করে ২.৩ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করা যায়। চিংড়ির আন্তজার্তিক বাজার মূল্য স্থিতিশীল থাকলে আরও বেশি মুনাফা পাওয়া সম্ভব। তাই পরিকল্পিত ও আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে গলদার সাথে তেলাপিয়ার মিশ্র চাষ করলে গতানুগতিক চাষের চেয়ে অনেকগুণ বেশি মুনাফ অর্জন করা সম্ভব।

সতকর্তা ও পরামর্শ

- পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট রাখতে হবে
- একই আকারের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুস্থ-সবল জুভেনাইল/পোনা মজুদ করা উচিত এবং পোনা সরাসরি খামারে মজুদ করা উচিত।
- নিয়মিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ মানসম্মত খাদ্য ও সার প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু কোন প্রাণির বিষ্টা জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।
- হাঁস/মুরগীর খাবার চিংড়ি/মাছের খামারে খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- নিষিদ্ধ কোন এন্টিবায়োটিক্স চিংড়ি/মাছের খামারে ব্যবহার করা যাবে না
- পানির গভীরতার উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে অন্তর একবার মানসম্মত পোড়া/ডলো চুন খামারে প্রয়োগ করা উচিত
- তলা আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। মাটিতে গ্যাস সৃষ্টি হলে সাময়িকভাবে খাবার বন্ধ রাখতে হবে এবং জাল টানতে হবে
- পানির রং সবুজ থাকা অবস্থায় কোন প্রকার সার প্রয়োগ করা যাবে না
- মাঝে মাঝে পানি ও মাটি পরীক্ষা করা উচিত। কোন ধরণের অসুবিধা হলে সাথে সাথে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসার বা কোন মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।